নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২৫)

পরিবারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

গোটা মানবসমাজটাই ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিবার। কোনও কারণে ব্যক্তিবিশেষকে তিনি কখনও পৃথক করে দেখতে চাননি। ব্যক্তিকে দেখার ক্ষেত্রে, নবজাগরণের মূল্যবোধ অনুসারে, চারিত্রিক গুণাবলীকেই তিনি একমাত্র মাপকাঠি ধরে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চলবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন। জন্ম এবং বৈবাহিক সূত্রে পারিবারিক সদস্যদের সাথে তাঁর আদানপ্রদান সেই দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাসকেই আরও সুদৃঢ় এবং শিক্ষণীয় ভাবে প্রকাশ করে।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাবা-মা'কে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, 'আমি কাশী মানি না, বিশ্বেশ্বর মানি না। আমি মা'কে মানি, বাবাকে মানি। আমার বাবা-ই আমার বিশ্বেশ্বর, আমার মা-ই আমার অন্নপূর্ণা।' কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখা দরকার, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবতী দেবী-কে নিছক বাবা-মা হিসেবেই বিদ্যাসাগর শ্রদ্ধা করতেন না। বাস্তবে এঁরা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দরদী হৃদয়ের ব্যক্তিত্ব। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করে ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরকে সেযুগের সর্বোচ্চ লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই প্রবল কষ্ট তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সচ্ছলতার উদ্দেশ্যে নয়। কলকাতা শহর থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে গ্রামে গিয়ে স্কুল খুলে বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রসার ঘটাবে, এই ছিল ঠাকুরদাসের অন্যতম লক্ষ্য। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি, বিশেষত তাঁর পড়াশুনার প্রতি সদা সতর্ক থাকতেন, কড়া নজর রাখতেন। তাঁর সারাদিনের আচার-আচরণে বা নির্দিষ্ট কোনও কাজে এতটুকু অবহেলা দেখলে ঠাকুরদাস তাঁকে নির্মমভাবে বকাঝকা এমনকি বেধড়ক মারধরও করতেন। অনেক সময় প্রতিবেশীরা ছুটে এসেও ঠাকুরদাসকে নিরস্ত করতে পারতেন না।

আশ্চর্য ভাবে, এহেন কড়া শাসনের পরেও বিদ্যাসাগর যত বড় হয়েছেন, বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ততই তাঁর বেড়েছে। সচরাচর বাবার মত না নিয়ে কাজ করেননি বিদ্যাসাগর। আবার, শ্রদ্ধা করতেন বলে প্রয়োজনে বাবার সাথে দ্বিমত হতেও পিছপা হননি। বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র ও এক ভাই ঈশানচন্দ্রকে ঠাকুরদাস স্নেহান্ধভাবে প্রশ্রয় দিয়ে ঠিক করছেন না, এতে তাদের ক্ষতি হচ্ছে— একথা যখন বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা লিখে চিঠি দিয়েছেন ঠাকুরদাসকে।

মা ভগবতী দেবী ছিলেন বিদ্যাসাগরের জীবন্ত প্রেরণাস্বরূপ। তাঁর প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। কিন্তু সে কি নিছক তিনি তাঁর মা বলে? একেবারেই তা নয়। বিদ্যাসাগর-চরিত লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবতী দেবীকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় ভগবতী দেবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একাধিক বিমুগ্ধ উচ্চারণ এক অসাধারণ স্বীকৃতি। তিনি লিখেছেন, "দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না।" কার্যত, ভগবতী দেবী ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, নির্ভীক, উদার এক ব্যক্তিত্ব। দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালবাসা-দয়া-মায়া প্রভৃতি অনেক গুণই ভগবতী দেবীর প্রভাবেই বিদ্যাসাগর-চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। বহুল প্রচলিত হলেও, ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গক্রমে দু-একটি ঘটনা স্মরণ করা যাক।

এক দুপুরে তিনি দেখলেন তাঁর ছোট্ট ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালা থেকে ফিরেছে অন্য কারও একটা ছেঁড়া ময়লা জামা গায়ে দিয়ে। ভগবতী দেবী ভাবলেন, 'কী ব্যাপার? ছেলে তো পরে গিয়েছিল ভাল একটা জামা!' তিনি খোঁজ নিলেন। জানা গেল, বন্ধুর গায়ে ছেঁড়া জামা দেখে বিদ্যাসাগর নিজের জামা খুলে দিয়ে দিয়েছে তাকে। আর তার জামাটি গায়ে ফেলে বাড়ি ফিরে এসেছে। শোনা মাত্রই ভগবতী দেবী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'খুব ভাল করেছিস বাবা, খুব ভাল করেছিস।'

একবার শীতকালে মায়ের গায়ে ছেঁড়া চাদর দেখে বিদ্যাসাগরের খারাপ লেগেছিল। টাকাপয়সা যোগাড় করে বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে কয়েকটা গরম জামাকাপড় কিনে গ্রামের বাড়িতে পাঠালেন। কয়েকদিন পর ভগবতী দেবী ছেলেকে জানালেন, বাবা, পারলে এইরকম গরম কাপড় আরও কিছু পাঠিও। বিদ্যাসাগর একটু কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। তিনি শুনলেন, আগের কাপড়গুলি আশপাশে যাদের গরম কাপড় নেই তাদের দিয়ে দিয়েছেন ভগবতী দেবী। কিন্তু এখনও কয়েকজন বাকি আছে। মা'র মুখটা মনে করে বিদ্যাসাগরের দু চোখের পাতা ভিজে গেল। পরদিনই আরও কিছু গরম কাপড় কিনে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

একবার হ্যারিসন সাহেব বিলেতে ফিরে যাওয়ার আগে বিদ্যাসাগরের গ্রামের বাড়িতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর একটু কিন্তু-কিন্তু করেও মা'কে সব জানালেন। মা তৎক্ষণাৎ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করতে বলে দিলেন। বিদ্যাসাগর খুশি হলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলাবলি শুরু করল, 'ইংরেজ সাহেব! মানে ম্লেচ্ছ ঢুকবে বামুনের বাড়িতে খেতে? বামুনের জাত যাবে যে!' ভগবতী দেবী এসব সংকীর্ণতায় কোনও তোয়াক্কা করার মানুষ ছিলেন না এবং যথারীতি সেসব করলেনও না। নির্দিষ্ট দিনে হ্যারিসন সাহেব এলেন বীরসিংহ গ্রামে। ভগবতী দেবীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর বিদ্যাসাগরের সাথে মাটিতে বসেই তিনি ভগবতী দেবীর রান্না চেয়েচিন্তে তৃপ্তি করে খেলেন।

একবার, অনেকদিন মা'কে কিছু দেননি বিদ্যাসাগর। কথাটা মনে হতেই মা'কে বললেন, 'তোমার কী চাই বল মা।' ভগবতী দেবী গম্ভীরভাবে বললেন, আমার তিনটি দামি গয়না চাই। বিদ্যাসাগর একটু অবাক হলেন, মা দামি গয়না চাইছে? তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী গয়না চাই, মা?' ছেলের করুণ দশা দেখে হাসি চাপতে পারলেন না ভগবতী দেবী। তিনি বললেন, 'অবৈতনিক স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় আর অন্নসত্র— গ্রামে এই তিনটি জিনিস আমার চাই।' মায়ের হাসির আলোয় বিদ্যাসাগরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জন্য কেবল বিদ্যাসাগরকে নয়, চরম হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল তাঁর বাবা-মা'কেও। প্রতিদিন তাঁদের গ্রামের বাড়ির সামনে দুনিয়ার জঞ্জাল ফেলে যেত রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ভাড়াটে দুষ্কৃতীরা। অথচ পুলিশ তাদের নামধাম চাইলে ঠাকুরদাস কিছুই বললেন না। তবু পুলিশ তথ্য যোগাড় করে তাদের ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। গ্রামের লোক পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হবে দেখে ভগবতী দেবীর মন কেঁদে উঠল। তিনি ওই সব লোকগুলির বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এলেন, যাতে পুলিশ মনে করে এরা দোষী নয়। লোকগুলিও হাজতবাস থেকে বাঁচতে ভগবতী দেবীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলে এলেন এবং ভোজ খেয়ে গেলেন। তারপর আর উৎপাত করেনি তারা।

বিদ্যাসাগর যখন সবেমাত্র বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরু করছেন, তখন কোনো একসময় তাঁর মনে হয়েছিল, বিরোধীদের সাথে লড়ে জেতা যাবে না। তখন ভগবতী দেবী বলেছিলেন, "একবার যখন কাজ শুরু করেছ, তখন সমাজকর্তাদের ভয়ে পিছিয়ে এসো না। উপায় একটা বেরোবেই। আমি প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করিতেছি। আহা! জনমদুঃখিনীদের যদি কোনো গতি করিতে পারো, তাহা এখনই কর বাবা।" লেখা বাহুল্য, এরপর বাকি ইতিহাসটা বিদ্যাসাগর ঠিকঠাকই লিখে দিয়েছেন।

নিজের জন্য চিন্তা না করে বিদ্যাসাগর অন্যের বিপদে যেমন সবসময় উদারভাবে সাহায্য করতেন, নিজের ভাই-আত্মীয়দেরও সেভাবে সাহায্য করেছেন। একইভাবে, কারও অন্যায় আচরণ দেখলে যেমন তার যথোচিত জবাব দিয়েছেন, আত্মীয়স্বজনদের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। এজন্য দুই ভাইয়ের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতিও ঘটেছিল, কিন্তু ভাই বলে বিদ্যাসাগর কোনও আপস করেননি। তাঁর একমাত্র ছেলে নারায়ণ যখন স্বেচ্ছায় বিধবাবিবাহ করতে এগিয়ে এসেছিল, তখন বিদ্যাসাগর খুশি হয়ে ছেলেকে সমর্থন ও সাহায্য করেছেন। আবার, সেই ছেলে যখন বিপথে গিয়েছে, বিবাহিতা স্ত্রীকে অপমান করেছে, বিদ্যাসাগর তখন একমাত্র ছেলেকেও ত্যাগ করেছেন, উত্তরাধিকারী হিসাবেও তাকে মনোনীত করেননি। এ নিয়ে স্ত্রী দিনময়ী বিদ্যাসাগরের প্রতি অভিমান করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর আপস করেননি। দিনময়ীকে তিনি সম্মান করতেন। অসংখ্য কাজের মাঝে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো তাঁকেও পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেননি বলে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "...বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে।" দিনময়ীকে বিদ্যাসাগর যথোচিত মর্যাদা দিতেন, সেও নিছক স্ত্রী হিসাবে নয়। দিনময়ী মূলত ঘরকন্নার কাজে থাকলেও বিহারীলাল সরকার তাঁর গুণাবলী প্রসঙ্গে লিখে গেছেন, মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা এবং চারিত্রিক তেজস্বিতার কথা লিখে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের মেয়ে বিনোদিনীর সাথে বিয়ে হয়েছিল শিক্ষক সূর্যকুমার অধিকারীর। বিদ্যাসাগর এই জামাইকে খুব ভালবাসতেন তার নানা দক্ষতা-যোগ্যতার জন্য। ১৮৭৬ সালে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের সব দায়িত্ব তিনি সূর্যকুমারকে দেন। খুবই দক্ষতার সাথে সূর্যকুমার সে দায়িত্ব পালন করছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তহবিল সংক্রান্ত একটা সমস্যা দেখা দেয়। সূর্যকুমার টাকাপয়সার যথাযথ হিসাব দিতে ব্যর্থ হন। কোনও আপস না করে বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইস্তফা দিতে বলেন এবং বৈদ্যনাথ বসুকে ওই পদে দায়িত্ব দেন।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের প্রবর্তক শুধু নন, কঠিন বাধা অতিক্রম করে অসংখ্য বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন। বিধবাবিবাহ করবে বলে বহু লোক তাঁকে ঠকিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বিদ্যাসাগর বলেছেন, ঠকা ভাল কিন্তু ঠকানো ভাল নয়। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে কোনও কারণে বীরসিংহে একটি বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগর মত দিলেন না। অথচ তাঁর দুই ভাই তাঁর সাথে কোনও আলোচনা না করে, কোনও কিছু তাঁকে না জানিয়ে, গ্রামের কয়েকজনের মদতে গোপনে সেই বিধবাবিবাহ দিয়ে দেন। এহেন নিকৃষ্ট আচরণের জন্য বিদ্যাসাগর খুব কষ্ট পান। আত্মীয় ও গ্রামবাসীদের জন্য এত কিছু করা সত্ত্বেও তাদের থেকে এতটা অপমান তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। গভীর দুখের সাথে তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'এখানকার হাসপাতাল, স্কুল এবং অন্যান্য যেখানে যা সাহায্য আমি দিই তা যথারীতি দিয়ে যাব, কিন্তু বেঁচে থাকতে আর কোনোদিন এই গ্রামে আসব না।' বাস্তবে সেদিনের পর আর কোনোদিন বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর যাননি। পরবর্তী কালে কলকাতায় হঠাৎ করেই একদিন 'বীরসিংহ জননীর পত্র' নামে একটি পুস্তিকা তাঁর হাতে আসে। শোনা যায়, গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে ছাপানো পুস্তিকা আকারে এই দীর্ঘ পত্র লিখে বিদ্যাসাগরকে গ্রামে আসার সকাতর অনুরোধ করেছিলেন। এই লেখা পড়ে বিদ্যাসাগর গ্রামে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থতার কারণে আর যেতে পারেননি।

(চলবে)

এনআরসি-সিএএ-র বিরুদ্ধে গবেষকদের প্রতিবাদ

এনআরসি এবং সিএএ-র বিরুদ্ধে ৯ জানুয়ারি কলকাতায়, কলেজ স্ট্রিটে গবেষক সংগঠন ডিআরএসও আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় এ কথা বলেন আহ্বায়ক বেঙ্গালুরুর আইসিটিএস-এর গবেষক ডঃ অর্ঘ্য দাস। এই বিক্ষোভে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, জে এন ইউ-এর প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, আইএসআই, এসআইএনপি, এসএনবিএনসিবিএস, বোস ইনস্টিটিউট, আইএসিএস, সি ইউ, জেইউ, ভি ইউ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষকরা এসেছিলেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন আইআইএসআই-এর অধ্যাপক পার্থসারথি রায় এবং সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সহ সম্পাদক অংশুমান রায়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

‘গো ব্যাক মোদি’। হাজার হাজার মানুষের স্লোগানে মুখরিত কলকাতা থেকে জেলা

মালদা

একের পাতার পর

১১ জানুয়ারিতে আবার দেখা গেল, দেশের মানুষের উপর সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নীতি এনআরসি-সিএএ-এনপিআর চাপিয়ে দেওয়ার প্রধান কারিগর নরেন্দ্র মোদিকে চায় না কলকাতা, চায় না বাংলা। সে কথাই মানুষ সোচ্চারে জানিয়ে দিল প্রতিবাদের গর্জনে। উঠল স্লোগান গো-ব্যাক নরেন্দ্র মোদি। কুশপুতুলে আগুন দিয়ে মানুষ সোচ্চারে বলল, ফ্যাসিস্ট মোদি ফিরে যাও।

মোদির বিমান কলকাতার মাটি ছোঁয়ার কথা ছিল তিনটে নাগাদ। কিন্তু বেলা আড়াইটাতেই কলকাতার এসপ্ল্যানেড অবরুদ্ধ। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর শয়ে শয়ে কর্মী-সমর্থকের হাতে ব্যানার ‘ক্ষুদিরামদের বাংলায় নাথুরামদের ঠাঁই নেই’। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের হাত তুলে ধরেছে কালো পতাকা, তাতে স্পষ্ট ঘোষণা— নরেন্দ্র মোদি ফিরে যাও। সন্তানের হাত ধরে এসেছেন মা। তাঁর গলার সাথে মিলে যাচ্ছে কিশোর কণ্ঠের স্লোগান। সেই ছিদ্রান্বেষীরা— যারা বারবার ছাত্ররা কেন প্রতিবাদের অঙ্গনে আসবে, এই নিয়ে নাকে কান্না কাঁদে, মানুষের অধিকার, মনুষ্যত্বকে বাঁচানোর এই মিছিলের সামনে তারা আজ কোথায়! বিশাল পুলিশ বাহিনী রাজভবনের দিকে গড়ে তুলেছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়। তাকে উপেক্ষা করেই মিছিল দখল নিল গোটা রাস্তার। এসপ্ল্যানেড-লেনিন সরণির মোড় অবরোধ করে চলল প্রতিবাদের ঝড়। নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলার মধ্যে এলাকার হকার, দোকানদার,

নদীয়া

সাধারণ মানুষ অনেকেই তখন হয়ে উঠেছেন বিক্ষোভের শরিক। শ’য়ে শ’য়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে উঠছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের বার্তা দিয়ে। অবরোধের পর মিছিল যখন মৌলালি মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, তাতে সামিল হলেন দলের কর্মী-

শিলিগুড়ি

সমর্থকদের বাইরেও অনেক মানুষ।

ওইদিন সমস্ত জেলা সদর সহ অসংখ্য শহর, গঞ্জ, বাজারে একইভাবে এস ইউ সি আই (সি) বিক্ষোভের কর্মসূচি নিয়েছিল। সব বিক্ষোভেই সামিল হয়েছেন সাধারণ মানুষ।

কলকাতা বন্দরকে শ্যামাপ্রসাদ নামাঙ্কিত করার তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

কলকাতা বন্দরের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এটিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামাঙ্কিত করার পরিপ্রেক্ষিতে এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৩ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ‘কলকাতা বন্দরের নাম যেভাবে প্রধানমন্ত্রী আকস্মিক ঘোষণায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামাঙ্কিত করলেন তা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত অগৌরবজনক। আরএসএস-হিন্দু মহাসভা-সঙ্ঘ পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেবল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখেননি, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে ভারত যদি ভাগ নাও হয় তিনি বাংলা ভাগের পক্ষপাতী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজি যখন প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করছিলেন ঠিক সেই সময় তৎকালীন বাংলা সরকারের মন্ত্রী হয়ে তিনি ভারতীয়দের ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগ দেওয়ানোয় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমন একজন বিতর্কিত মানুষের নামে কলকাতা বন্দরের নাম রাখা কোনওভাবেই যুক্তিযুক্ত ও বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি।’

জেএনইউ গেটে ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে এআইডিএসও

স্টেট ব্যাঙ্কের এটিএম-এ কর্মরত সুরক্ষা কর্মীদের বেতন নিয়ে টালবাহনা

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এটিএম-এ কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীদের বেতন প্রদান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানবাহানা চলছে। ব্যাঙ্ক এবং ভেন্ডাররা (কন্ট্রাকটর) দু’মাস অন্তর বেতন দিচ্ছে। ফলে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত বেতন না পাওয়ার ফলে তাঁরা অর্থনৈতিক ভাবে খুবই দুরবস্থার মধ্যে পড়েছেন। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে কর্মচারীরা কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পতাকাতলে সংগঠিত হচ্ছেন এবং আন্দোলন গড়ে তুলছেন। এসবিআই-এর রায়গঞ্জ, বারুইপুর আঞ্চলিক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এবং শিলিগুড়ি আঞ্চলিক অফিসে ফোরামের নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ডেপুটেশনগুলিতে নেতৃত্ব দেন কমরেড গোপাল দেবনাথ, কমরেড মনোজ মণ্ডল ও অন্যান্যরা।

কর্ণাটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বয়কটের ডাক আশা কর্মীদের

৩ জানুয়ারি বেঙ্গালুরু শহর সাক্ষী থাকল এক ‘গোলাপী প্লাবনে’র। এদিন কর্ণাটকের এই রাজধানী শহরে মাসিক ন্যূনতম ১২ হাজার টাকা সাম্মানিক ও ১৫ মাস ধরে বকেয়া ভাতার কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় অংশের দাবিতে ‘কর্ণাটক রাজ্য সংযুক্ত আশা কার্যকর্ত্যারা সংঘ’-এর ডাকে প্রায় ৩০ হাজার গোলাপী শাড়ি পরিহিতা আশা কর্মী সামিল হয়েছিলেন এক বিশাল মিছিলে। রেলস্টেশন থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি ফ্রিডম পার্কে পৌঁছায় এবং সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য দিবারাত্র ধরনায় বসেন আশা কর্মীরা।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কে রাধাকৃষ্ণ, এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক কে উমা সহ নানা গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন কর্ণাটক রাজ্য সংযুক্ত আশা কার্যকর্ত্যারা সংঘের রাজ্য সভাপতি কে সোমশেখর ইয়াডাগিরি।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মীদের এক প্রতিনিধিদল ধরনাস্থলে আসেন এবং স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তাঁরা জানান, স্বাস্থ্য মন্ত্রক আশা কর্মীদের সাম্মানিক ১ হাজার টাকা বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। বকেয়া টাকাও কর্মীদের দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিতে দাবি পূরণ হবে না বুঝে, যতদিন না বকেয়া টাকা প্রত্যেক আশা কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসছে, ততদিন কাজ বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com